বাংলাদেশ ২০১৩ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্ট
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সংবিধান এবং অপরাপর আইন ও নীতিমালাসমূহ ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সুরক্ষা প্রদান করে। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম হলো রাষ্ট্রধর্ম, কিন্তু এই মর্মেও আবার নিশ্চিয়তা দেয়া হয়েছে যে, দেশটি হবে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যা "হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অপরাপর ধর্মসমূহের প্রতিপালনে সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকার নিশ্চিৎ করবে।" মাঝে মধ্যে পুলিশ সমেত সরকারি কর্মকর্তারা সহিংসতা থেকে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহকে সুরক্ষা প্রদানে নিষ্পৃহতা দেখিয়েছে, এবং এই ধরণের সহিংসতায় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত মহলের বিজড়নের অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা প্রদান করার জন্য এবং সহিংসতায় বিনষ্ট ধর্মীয় ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ধর্মীয় আনুগত্য, বিশ্বাস, কিংবা আচারের ভিত্তিতে সামাজিকভাবে অন্যায় আচরণ প্রদর্শন এবং বৈষম্যের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়স্থান এবং বাড়ীঘরে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে আক্রমন চালানোর ও লুটপাটের অনেক বেশী ঘটনা সারাদেশে ঘটেছে। সংখ্যাগুরু সুন্নী মুসলিম গোষ্ঠির সদস্যরা মাঝে মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনকে হেনস্থা করেছে বা শারিরীকভাবে তাদের উপর আক্রমন চালিয়েছে। সরকার এবং নাগরিক সমাজের অনেক নেতৃবৃন্দ বলেছেন যে, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সাথে সচরাচর অর্থনৈতিক বা ফৌজদারি অপরাধজনিত বিষয়াদির প্রলেপ জড়ানো থাকে, এবং এগুলোকে শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুগত্য বা বিশ্বাসজনিত ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যাবেনা। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে অর্থনৈতিক বিচারে যারা সমাজে নি¤œতর স্তরের আওতায় পড়েন, তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করতে, কিংবা অপদস্থ হওয়ার সময় কিংবা সহিংসতার সময় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদিত করতে অক্ষম থাকেন বলে তাদের অবস্থাটা আরো খারাপ।

সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতে এবং খোলা বিবৃতিতে মার্কিন দূতাবাস ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিষয়ে কঠোর উৎকন্ঠা জানিয়েছে এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের অধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করতে সরকারকে উৎসাহ প্রদান করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে সর্মথন জুগিয়েছে।

অংশ ১: জনসংখ্যার ধর্ম-ভিত্তিক বিভাজন

মার্কিন সরকারের অনুমিত এদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৩.৭ মিলিয়ন (জুলাই ২০১৩ এর হিসাবমতে)। ২০১১ এর জনমিতি অনুসারে মোট জনসংখ্যার মধ্যে সুন্নী মুসলিমদের সংখ্যা ৯০ শতাংশ এবং হিন্দুরা ৯.৫শতাংশ। বাকীরা প্রধানত খৃষ্টান (অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক) এবং থেরাভাদা-হিনয়না বৌদ্ধ। অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলিম, বাহাই, সর্বপ্রাণবাদী, এবং আহমদিয়া জনগোষ্ঠিও এখানে আছে। এদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের অনুসারীদের জনসংখ্যা কয়েক হাজার থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত অনুমান করা হয়ে থাকে। নৃতাত্বিক এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ প্রায়শই মিশ্রিত হয়ে বসবাস করে এবং প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে এদের ঘনত্ব বেশী। বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের দেখা যায় প্রধানতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী (অবাঙ্গালী) জনগোষ্ঠির মধ্যে। বাঙ্গালী এবং সংখ্যালঘু নৃতাত্বিক খৃষ্টানরা দেশজুড়ে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে, তবে বরিশাল শহর, বরিশাল জেলার গৌরনদী, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর, ঢাকার মনিপুরি পাড়া, মহাখালের খৃষ্টানপাড়া, গাজীপুরের নাগরি, এবং খুলনা শহরে এদের ঘনত্ব তূলনামূলকভাবে বেশী।

নাগরিক নয় এমন অধিবাসীদের অনেকেই ঐসব পরিবারের সন্তান যেসব পরিবার আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখন্ডে বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছে এবং তারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। এখানে বর্মা থেকে আগত নিবন্ধিত আনুমানিক ৩০,০০০ রোহিংগা শরণার্থী, আর বর্মা থেকে আগত ২৫০,০০০ থেকে ৪৫০,০০০ অ-নিবন্ধিত রোহিংগা শরণার্থী দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে কক্সবাজারের আশেপাশে ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসাবে বসবাস করে আসছে।

অংশ ২: ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করার ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান

আইন/নীতিমালা-নিবিষ্ট কাঠামো

সংবিধান এবং অন্যান্য আইনকানুন ও সরকারি নীতিমালা সাধারণভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সুরক্ষা প্রদান করে। সংবিধানে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে সকল ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার সম্বলিত বিধান আছে। ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলেও সংবিধান এই নিশ্চয়তা প্রদান করে যে দেশটি হবে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ। পারিবারিক আইনসমূহে মুসলিম, হিন্দু এবং খৃষ্টানদের জন্য পৃথক পৃথক বিধান রাখা হয়েছে।

সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্ম-ভিত্তিক ইউনিয়ন, সংগঠন, বা রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

দন্ড-বিধির আওতায়, যে কোন ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষমূলক মনোভাব-প্রসূত বক্তব্য বা কর্ম, যা ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত বা অপদস্থ করে, সেগুলি অর্থদন্ড বা দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড প্রদানের মত অপরাধ হিসাবে গণ্য। তা ছাড়াও, ফৌজদারী কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে যে, সরকার কোন সংবাদপত্রের সকল কপি জব্দ করতে পারবে যদি তাতে জণগণের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার মত কোন কিছু প্রকাশ করা হয় বা কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত দেওয়ানি বিষয়াদিতে ইসলামী আইনের ভূমিকা রয়েছে; অবশ্য, ইসলামী আইনের কোন আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ নেই, আর অ-মুসলিমদের উপর তা প্রয়োগ করাও হয়না। ভূমির মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল পারিবারিক বিরোধ এবং অন্যান্য দেওয়ানি বিষয়াদিতে বিবাদ-বিসম্বাদের বিকল্প সমাধানের পথ উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে, সালিশকারকগণ বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইসলামি বিধি-বিধান সমর্থিত নীতিমালার উপর নির্ভর করেন।

সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশনায় শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ের সমাধানে ফতোয়া প্রদান করার সুযোগ রাখা হয়েছে এবং শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে সেটাকে ব্যবহারের কোন সুযোগ নাই।

বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ও দত্তক গ্রহণের পারিবারিক আইনসমূহে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা অনুসারে কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম এবং হিন্দু পারিবারিক আইনসমূহ দেশের আইনী কাঠামোর মধ্যে আইনের বিধান দ্বারা সংহত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে, একজন মুসলিম পুরুষ চারজন পর্যন্ত নারীকে বিবাহ করতে পারবে, তবে একজনের চেয়ে বেশী নারীকে বিবাহ করার আগে তাকে অবশ্যই আগের স্ত্রী বা স্ত্রীগণের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। খৃষ্টানরা শুধুমাত্র একজন নারীকে বিবাহ করতে পারবে। হিন্দু আইনে বন্ধ্যাত্য, নির্যাতন, বা পাগল হওয়ার মত সীমিত কিছু পরিস্থিতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধান আছে, আর হিন্দু বিধবারা আইন-সম্মতভাবে পুনর্বিবাহ করতে পারে। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানাদি এবং পদ্ধতি-প্রক্রিয়া উভয় পক্ষের ধর্ম-নির্ভর পারিবারিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মুসলিমদের বিবাহ সরকারিভাবে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক হলেও হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন করা ঐচ্ছিক, আর অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজ নিজ অনুসরণীয় নির্দেশিকা নিজেরাই স্থির করতে পারে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃধর্ম বিবাহে আইনত কোন বাধা নেই।

মুসলিম পারিবারিক আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীরা পুরুষদের চেয়ে কম সম্পত্তি পেয়ে থাকে, আর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীদের অধিকার কম। স্বেচ্ছাচারমূলক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো কিংবা আগের স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে পুনর্বিবাহ করার বিরুদ্ধে নারীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইনী বিধান রাখা হয়েছে, তবে সাধারণভাবে সেটা নিবন্ধিত বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আইনানুসারে একজন মুসলিম স্বামী তার সাবেক স্ত্রীকে তিন মাসের ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য, তবে আইন প্রয়োগকারি কর্তৃপক্ষ এই বাধ্যবাধকতার প্রয়োগ সবসময় করেন না।
ধর্মীয় হিসাবে সম¦ন্ধিত সকল বেসরকারি সংগঠনের (এনজিও) ক্ষেত্রে সরকারি এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যূরোর সাথে নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক, যদি সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য সেগুলি বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে। অনুরূপ কোন বৈদেশিক আর্থিক সহায়তা গ্রহণ না করলে তখন তাদের নিবন্ধিত হওয়া আবশ্যক নয়।

সরকার ইমামদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি পরিচালনা করে থাকে এবং ইসলামি পর্বের দিনসমূহ উদযাপন করে, তবে সাধারণত খুতবার নসিহতের বক্তব্য চাপিয়ে দেয়না বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রদানকারি ব্যাক্তিদের বাছাই করেনা, বা তাদের বেতন ভাতাও দেয়না। অবশ্য বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদসহ সকল সরকারি মসজিদে ইমাম নিয়োগ করার বা অপসারণ করার কর্তৃত্ব সরকারের হাতে আছে, আর এই সকল সরকারি মসজিদের খুতবায় সরকার পরোক্ষ প্রভাবও বিস্তার করে থাকে। মাদ্রাসাসমূহের ধর্মীয় পাঠ্য বিষয়াদির বক্তব্য সরকার পরিবীক্ষণ করে থাকে।
সরকারি বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষা পাঠক্রমের অংশ। ছাত্র-ছাত্রীরা সেইসকল শ্রেণীকাজে অংশ নেয় যেখানে তাদের নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাসের বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। যে সকল বিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ে পাঠদানের জন্য সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম সে সকল বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় গীর্জা বা মন্দিরের সাথে প্রায়শই বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময়সূচির বাইরে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য শ্রেণীকাজের ব্যবস্থা করে নেয়।

বিশ্ব-ব্যাংকের ২০০৯ সালের এক সমীক্ষামতে, প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ৮ শতাংশ এবং মাধ্যামিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ১৯ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচি অনুসারে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা মসজিদ সংলগ্ন ফোরকানিয়া মাদ্রাসায়, ধর্মীয় শিক্ষার সাথে ধর্ম-বহির্ভূত শিক্ষার মিশ্রণে পাঠদানকারি ক্যাডেট মাদ্রাসায়, ধর্ম-নিরপেক্ষ সরকারি বিদ্যালয়ে, এনজিও-পরিচালিত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে, অথবা স্কুলে যায়না। সরকার পরিচালিত কোন খৃষ্টান, হিন্দু, বা বৌদ্ধ বিদ্যালয় আছে বলে জানা নেই, যদিও সারা দেশে বেসরকারি ধর্মীয় বিদ্যালয় ছড়িয়ে

ছিটিয়ে আছে। পল্লী অঞ্চলের আনুমানিক ২ শতাংশ ছাত্র–ছাত্রী কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে, এগুলি স্বাধীন বেসরকারি মাদ্রাসা যা সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মকান্ডের জন্য চারটি সরকারি তহবিলের ব্যবস্থাপনা করে থাকে: ইসলামিক ফাউন্ডেশান, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, খৃষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, এবং বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট। এই ধর্মীয় তহবিলগুলো তাদের প্রদত্ত তহবিলকে স্বাক্ষরতা ও ধর্মীয় কর্মসূচিতে, উৎসবাদির উদযাপনে, ধর্মীয় গৃহ সংস্কারের কাজে, এবং হত–দরিদ্র পরিবারসমূহকে সহায়তা প্রদান করার কাজে ব্যবহার করে থাকে।

সরকারি আচার ব্যবস্থা

কিছু সরকারি আচার ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছে, যেমন ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আরোপ, কিংবা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা রোধে বা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করায় ব্যর্থতা। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা অভিযোগ করেছেন যে, সরকার সমর্থিত ব্যক্তিবর্গরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমন চালাতে ইন্ধন প্রদান করেছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধে ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে, যদিও ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করার সংজ্ঞাটি দেশের আইনী কাঠামোতে কোন বড় ধরণের পরিবর্তন সাধনকর্ম দ্বারা সমর্থিত নয়।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা অভিযোগ করেছেন যে, বেসরকারি অপরাধ সংঘঠনকারি কর্তৃক তাদের উপর অন্যায় আচরণ ঠেকাতে সরকার কোন কোন সময় ব্যর্থ হয়েছে। তারা উল্লেখ করেছেন যে কোন কোন ঘটনায় পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে, আর আদালতও কার্যকরভাবে সুবিচার করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। রামু, উখিয়া ও টেকনাফে ডিসেম্বর ২০১২ সালের আক্রমনের পর উনিশটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ ৭টি মামলার সম্পৃক্ততায় ৩৬৪ জনকে অভিযুক্ত করে ১৯৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু আসল মামলা যেটি সেটি থেমে আছে। যে স্থানীয় বৌদ্ধ যুবক উত্তেজনা সৃজনকারি উপাদান ইন্টারনেটযোগে ছড়িয়েছিল, এবং যে কারণে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, এবং তদন্তকারি দল তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পারেনি। উক্ত যুবকের পরিবার তার সম্পর্কে কোন তথ্য জানেনা, বা সে কোথায় আছে, কেমন আছে তাও কিছু জানেনা। এনজিওসমূহ, বিদ্যোৎসাহী পর্যবেক্ষকগণ, এবং বহু সাংবাদিক অভিযোগ করেছেন যে ২০১২ সালে রামুতে বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় স্থানে আক্রমনের ঘটনাটি সংঘটন করার নেপথ্যে সরকারি দল আওয়ামি লীগের অঙ্গভুক্ত ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। স্থানীয় সুশীল নাগরিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেছেন যে, রামুর ঘটনা–পরবর্তী সরকারি

তদন্তে চিহ্নিত প্রথম ১০ জন অপরাধীর সকলেই সরকারি দলের সাথে সম্পৃক্ততার সুবাদে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য, ২০১২ সালের আক্রমনের ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকার যেভাবে সাড়া প্রদান করেছিল তার মধ্যে আছে ২০০ মিলিয়ন টাকা (২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ব্যয়ে পুড়ে যাওয়া ১৯টি মন্দির এবং ধর্মশালাকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে পুনর্নিমান করা। সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে রামু এবং উখিয়াতে পুনর্নির্মিত কাঠামোগুলোর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে তার দল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নভেম্বর মাসে পাবনার বনগ্রামের এক হিন্দু-প্রধান গ্রামেই একদল উশৃঙ্খল জনতা একজন হিন্দু ব্যক্তিকে আক্রমন করে এবং ২৬টি গৃহস্থবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কথিত আছে যে, ঘটনার শিকার হওয়া ব্যক্তিটি অপরাধ সংঘটনকারি যে সকল লোকের নাম বলেছেন পুলিশ তাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি, কিন্তুআক্রমনের সময় যে ব্যক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন পুলিশ তাকেই গ্রেপ্তার করেছে। সহিংসতাটা এমন একটা অভিযোগ থেকে সূত্রপাত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে ১০ম শ্রেনীর একজন হিন্দু ছাত্র সামাজিক নেটওয়ার্কের কোন এক পাতায় নবী মোহাম্মদ সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি প্রচার করেছে। শতশত লোক ছাত্রটির বাড়ি আক্রমন করে, এবং তাকে না পেয়ে, তার বাবাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায় এবং তাকে মারধর করে, আর বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক তদন্তে ঐরূপ প্রচারের সাথে উক্ত ছাত্রের সম্পৃক্ততার কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। বাদি হয়ে ৩০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করলে পুলিশ নয়জনকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম এই আক্রমনের জন্য একটি স্থানীয় অপরাধী চক্রকে দায়ী করে যারা হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর অনেকদিন ধরে চাঁদাবাজি চালিয়ে আসছিল। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল- আওয়ামি লীগ এবং বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি)- উভয়েই বলেছে যে অপরাধী চক্রটি অন্য দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ের নিরাপত্তা হেফাজতে আছে।

আরও অভিযোগ রয়েছে যে, সম্মোহনীব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ইসলামি নেতা মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীকে দেয়া ২৮শে ফেব্রুয়ারির মৃত্যু দন্ডাদেশের পর দুই সপ্তাহ ধরে হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতা রোধ করতে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি। ঢাকার প্রধান মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুজা কমিটি জানিয়েছে যে আক্রমনের সম্পৃক্ততায় ১২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ মাত্র একজন অফিসারকে বদলী করে (এ ধরণের বদলী প্রশাসনিক শাস্তির সার্বজনীন পদ্ধতি)। সহিংসতার মুখে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এবং শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী মার্চের ৮ ও ৯ তারিখে উপদ্রুত

এলাকা পরিদর্শনে যান, একইরূপ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনার। যারা ঘরছাড়া হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য অস্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্থরা ক্ষয়ক্ষতির জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণের, এবং তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জোরদারকরণসহ আক্রমনকারিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার দাবি জানিয়েছিল। ৩রা মার্চ সরকার কোটালিপাড়ায় জামাত-ই-ইসলামী দলের ৬ সমর্থককে, এবং ১১ই মার্চ তারিখে জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের (শিবির) চারজন সদস্যকে, বাঁশখালি ও সীতাকুন্ডে আক্রমন চালানোর সংশ্লিষ্টতায়, গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকার ইন্টারনেটে বিচরণের স্থলসমূহ আটকে রাখা অব্যাহত রেখেছে এবং সংবাদ মাধ্যম প্রসূত উপাদানসকল যা তাদের বিবেচনায় ধর্মীয় কারণে অশোভনীয়, সেগুলিকে ছেটে দিয়েছে। এপ্রিলে ঢাকার পুলিশ "ইসলাম ও হিন্দুত্ববাদকে আক্রমন" শীর্ষক আহ্বান-লিপি ছাপানোর অভিযোগে অপপ্রচারকারিদের গ্রেপ্তার করে, তাদের কম্পিউটার, মডেম, এবং বহিস্থ্য যান্ত্রিক সরঞ্জামসমূহ জব্দ করে। বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন ও রেডিও কমিশন ৪ঠা এপ্রিল ঘোষণা করে যে, তারা দুটি অপপ্রচারণা-স্থলের (সামহয়ারইনব্লগ.নেট এবং আমারব্লগ.কম) অধিকাংশ বিবৃতি-বক্তব্য ইসলাম ধর্মের এবং নবী মোহাম্মদের অবমাননা করার জন্য অপসারিত করেছে। অপপ্রচারকারি সুব্রত অধিকারি শুভ, রাসেল পারভেজ, মশিউর রহমান বিপ্লব, এবং আসিফ মহিউদ্দীনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা, যাতে রাষ্ট্র বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়ানোর মত অবমাননাকর তথ্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে ছাপানোকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় সেটা লংঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বছরের শেষ নাগাদ মামলাটি চলছিল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জনগোষ্ঠিসমূহ ইসলাম ধর্ম থেকে মানুষকে ধর্মান্তরের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রায়ই আপত্তি করেছে। ১৪ সেপ্টেম্বের তারিখে টাঙ্গাইলের বিলাথুয়াগানিতে স্থানীয় কর্মকর্তারা ২৫ জন মুসলমানের খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর একটি খৃস্টান ধর্মীয় অফিস এবং সমাবেশ কক্ষ নির্মানের কাজ বন্ধ করে দেয়। রেভারেন্ড মৃণাল কান্তি বারৈ জানান যে পরিষদ চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ফারুক তাকে স্থানীয় সরকার অফিসে ডেকে নিয়ে যান এবং তিনি ইসলাম ধর্মে ফেরত না আসলে তাকে মারধরের হুমকি দেন। কথিত আছে যে, জবাবে বারৈ ফারুক এবং সমাজের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গদের নিকট সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতা সুরক্ষার উল্লেখ করেন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সহায়তার আবেদন জানান। স্থানীয় সরকারের তরফ হতে এই গোষ্ঠিটির বিরুদ্ধে আর কোন কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তবে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ২৫ জন আগের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। এটা ভয়-ভীতির কারণে না অন্য কোন কারণে হয়েছে সেটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

আগষ্টে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান লংঘন করার দায়ে দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামি রাজনৈতিক দল, জামাত-ই-ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে দেয়, এর ফলে নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহণ করার জন্য নিষিদ্ধ থাকবেন। বাস্তবে এই নিষেধাজ্ঞার কার্যকর প্রয়োগ করা হয়নি।

ফতোয়া দেয়ার উপর সুপ্রিম কোর্টের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা সত্বেও গ্রাম্য ধর্মীয় নেতারা মাঝে মধ্যে কিছু ঘোষণা জারি করেছেন যেগুলিতে তারা ফতোয়া বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধরণের ফতোয়ার কারণে বিচার বহির্ভূত শাস্তির মত পরিণতির সৃষ্টি হয়েছে যা প্রায়শই নারীদের বিরুদ্ধে, এবং অপরাধ হলো সন্দেহজনক নৈতিকতার স্খলন।
জুনের ১৩ তারিখে সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তারা ঢাকার সর্ব-মুসলিম ছাত্র অধ্যূষিত এক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে একজন হিন্দু মাধ্যমিক শিক্ষকের ২৯শে মে তারিখের বদলী আদেশ বাতিল করে দেয়। এই সর্ব-মুসলিম বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের (এলামনাই) প্রতিবাদের পর সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তারা তাকে একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে পদায়ন করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

আগের বছরগুলোর বিপরীতে, সামরিক বা সরকারি চাকুরিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে মর্মে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যদিও সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারিদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশের কোন আবশ্যকতা নেই তথাপিও ব্যাক্তির নাম থেকেই ধর্মীয় পরিচয় সাধরণভাবে নির্ধারণ করা যায়।
উগ্রপন্থীদের আক্রমনের শিকার হওয়ার মতো ঝুঁকিসম্পন্ন মর্মে বিবেচিত সকল ধর্মীয় উৎসবাদিতে এবং উপলক্ষ্যস্থলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা সরকার অব্যাহত রেখেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা ও জনসমক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালি উৎসবসমূহ উদযাপনে উৎসাহ জুগিয়েছে। দূর্গা পূজা, খৃস্টমাস, ঈস্টার, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, এবং পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) সবগুলিই সরকারের এ ধরণের সহযোগিতা পেয়েছে।

সরকারি নিষ্পৃহতা

সরকার অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় হিন্দুদের নিকট থেকে অধিগ্রহণ করে নেয়া ২.৬ মিলিয়ন একর জমি সংক্রান্ত ঝুলে থাকা দশ লক্ষেরও অধিক মামলার একটিও নিষ্পত্তি করেনি।

অংশ ৩: ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সামাজিক পর্যায়ে শ্রদ্ধাবোধের হালঅবস্থা

ধর্মীয় আনুগত্য, বিশ্বাস, বা আচার অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে সামাজিক নিগ্রহ বা বৈষম্যমূলক আচরণের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতি সহিংসতা অব্যাহত ছিল যাতে জীবননাশ এবং সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তবে এটা নির্ণয় করা কঠিন যে আক্রমনগুলোর অভিপ্রায়ে কতকাংশে ধর্মীয় শত্রুতা বা অপরাধমূলক মনোবৃত্তি, ব্যক্তিগত বিরোধ, সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ বা এসব একাধিক হেতুর সংমিশ্রণজনিত কারণ নিহিত ছিল। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সামাজিক-আর্থিক হাল-অবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই নি¤œস্তরের, আর তাই তাদের প্রতি কৃত অন্যায়-অবিচারের রাজনৈতিক উপায়ে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষীণ। নিগ্রহের সচরাচর উপায় হলো ধর্মীয় স্থানে ও বাড়িঘরে অগ্নি-সংযোগ এবং লুটপাট।

স্থানীয় প্রধান মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে), যারা সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত সহিংসতার বার্ষিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, তাদের হিসাবে গত বছর ৪৯৫টি বিগ্রহ, ধর্মশালা, বা মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে; ২৭৮টি বাড়িঘর এবং ২০৮টি দোকান ধ্বংস করা হয়েছে; ১৮৮ জন মানুষ আহত হয়েছেন; এবং এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মতে এইসব আক্রমনের জন্য শিবির দায়ী।

বিএনপি এবং এর সহযোগিদল জামাত এহেন আক্রমন বন্ধ করার আহবান জানায় এবং সহিংসতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এএসকে উল্লেখ করেছে যে জামাত সমর্থিতদের পরিচালিত আক্রমনের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধাপরাধীদের আর কোন বিচার যাতে অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য সরকারকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা।

সারাবছর জুড়েই হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমন অব্যাহত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৫ই অক্টোবর তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদার ১৫ জন দূর্গাপূজা পালনকারি বাসিন্দা বলেছেন যে এই উৎসবের জন্য তারা যে উপাসনালয় স্থাপন করেছিল তাতে শিবির কর্মীরা আক্রমন চালায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ধর্মীয় কারণসঞ্জাত নয় সেটাও ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে কেননা অধিবাসিদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, অথবা উপজাতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের। ইন্টারন্যাশনাল খৃশ্চিয়ান কনসার্ন (আইসিসি) নামক একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, পাঁচ থেকে দশ জনের একটি ছোট চক্র পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েকটি পরিবারের কাছে গিয়ে তাদের সন্তানদের খৃষ্টান ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ দেয়ার কথা জানায়। আইসিসি-র বক্তব্য অনুসারে পাচারকারিরা এই সন্তানদের মাদ্রাসায় বিক্রি করে দেয় যেখানে তাদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়। আইসিসি বলেছে যে, এরপর এই সন্তানদের নতুন নামকরণ করা হয় এবং পরিচয়পত্র দেয় হয়, এবং পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ করতে অনুমতি দেয়া হতোনা।

আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়কেও অপদস্থ হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রক্ষণশীল মুসলিম গোষ্ঠি তেহরিক-এ-খতমে নবুয়ত জানুয়ারির ৩ তারিখে আহমদিয়াদেও বিরুদ্ধে ঢাকায় শোভাযাত্রা করে। এই একই গোষ্ঠি ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে কালিয়াকৈরে ২০,০০০ জনতার সমাবেশ ঘটিয়ে আহমদিয়াদের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের শামিয়ানা. তাঁবু, এবং মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

অংশ ৩: মার্কিন সরকারের নীতি

দূতাবাসের কর্মকর্তারা সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সাথে, এবং প্রচার মাধ্যমের সাথে আলোচনার সময় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের অধিকারের বিষয়ে অব্যাহতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি হুমকির বিষয়ে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করতে এবং তাদের প্রতি সমর্থন জানাতে রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা সারাদেশে সফর করেছেন। সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দূতাবাসের কর্মকর্তারা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য, এনজিও, এবং স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের অধিকারকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তাদের উৎসাহ দিয়েছেন।

দূতাবাসের কর্মকর্তারা সরকার ও বিরোধী দলের কাছে সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সমস্যাবলি নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে যাচ্ছেন। মার্চ এবং নভেম্বরের আক্রমনের ঘটনার পর এই সহিংসতাকে প্রকাশ্যে এবং ঘরোয়াভাবে নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। রাষ্ট্রদূত এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সফরকারি কর্মকর্তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতা এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সুরক্ষার বিষয়ে মার্কিন নীতির উপর নিয়মিতভাবে জোরারোপ করেছেন।

ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং সকল ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করার নিমিত্ত রাষ্ট্রদূত এপ্রিলে হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে ঢাকেশ^রী মন্দির, মে মাসে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মন্দির, এবং সেপ্টেম্বরে ঔদাত্য হিন্দু মন্দির পরিদর্শন করেন। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমনের বিষয়ে উদ্বেগ জানাতে ইন্টারফেইথ ডায়ালগ নামের অধুনাসৃষ্ট এক ফোরামের আয়োজিত আন্তধর্মীয় সম্মেলনেও রাষ্ট্রদূত যোগদান করেন।
দেশটির ধর্মনিরপেক্ষ ও পরমতসহিষ্ণু চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করার মানসে রাষ্ট্রদূত এক আন্তধর্মীয় ইফতার পার্টি ও এক খৃসমাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যাতে সরকারি কর্মকর্তারা এবং ধর্মীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। দূর্গা পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, এবং স্থানীয় খৃসমাস উৎসবাদির উদযাপনে দূতাবাসের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দূতাবাসের সমর্থনকে প্রতিফলিত করেছে।

প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠক্রম উন্নতকরণের বিষয়ে মাদ্রসার স্বার্থের সাথে সম্পৃক্তদের সঙ্গে দূতাবাস আলোচনা বৈঠক করেছে। সারাদেশে ধর্মীয় বৈচিত্র এবং পরমতসহিষ্ণুতার মূল্যবোধকে অগ্রসরতা প্রদানের নিমিত্ত দূতাবাস-সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচিসমূহে ৮০ জনেরও অধিক মাদ্রাসা ছাত্র এবং ৫৩৩ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।